ভূতের বাঁশি

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ছবি: কৃষ্ণেন্দু চাকী

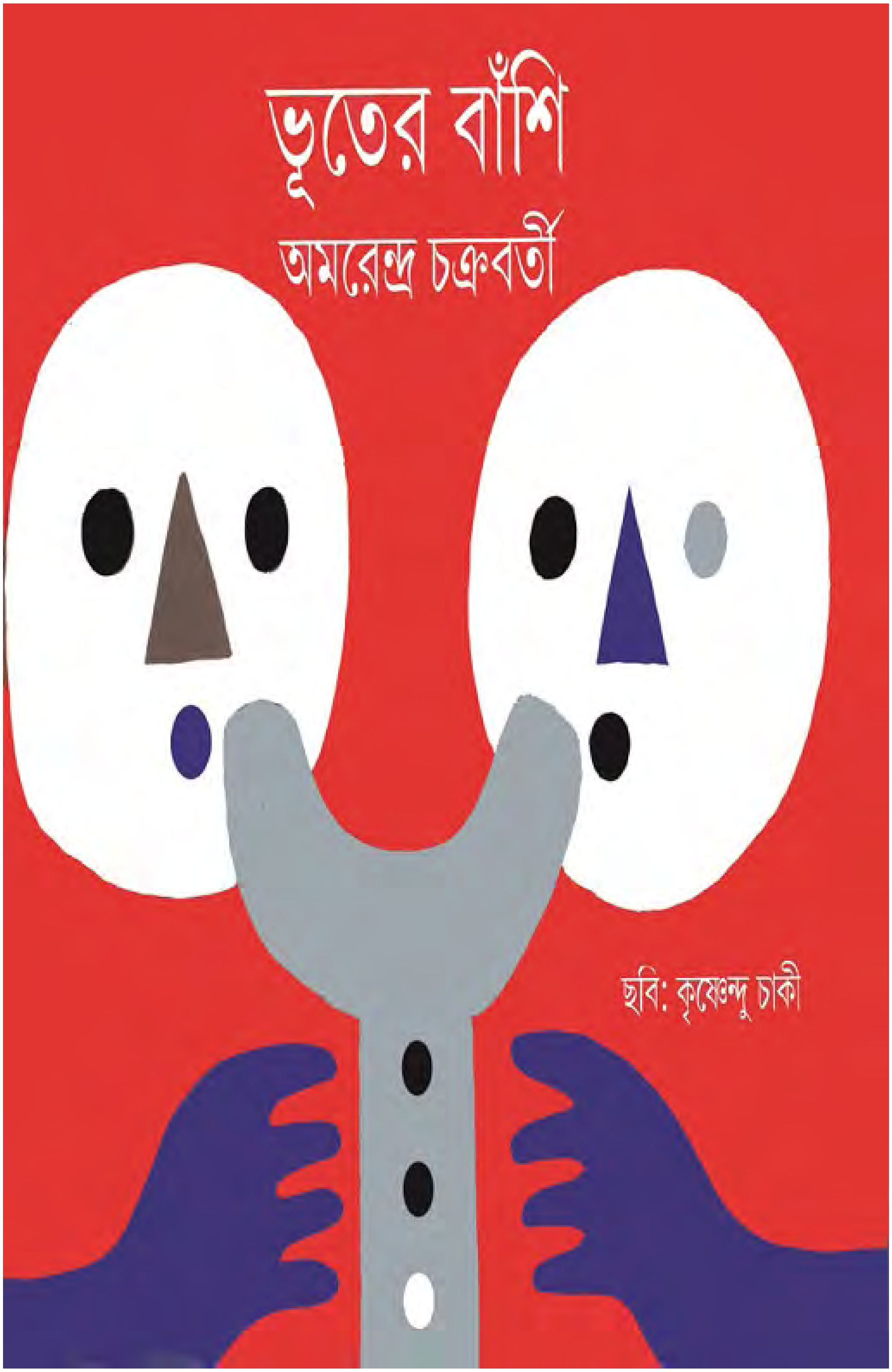
ভূতের বাঁশি
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ছবি: কৃষ্ণেন্দু চাকী

ভূতের বাঁশি

ভূতের বাঁশি

অমরে.   চক্রবর্তী
ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

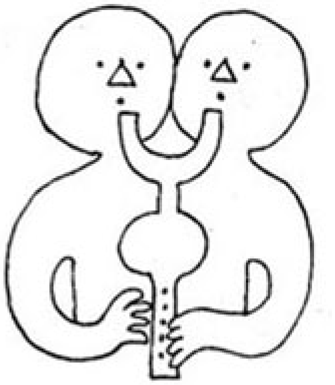

স্বর্ণাক্ষর

BHOOTER BANSHI

A Collection of Bengali Short Stories for Children by Amarendra Chakravorty

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০২

প্রথম স্বর্ণা. র সংস্করণ
ডিসেম্বর ২০১০
(২,০০০ কপি)

আঙ্গিক পরিকল্পনা
সোমনাথ ঘোষ

প্রচ্ছদপট ও অন্যান্য ছবি
কৃষ্ণেন্দু চাকী

ISBN 81-86891-68-4

প্রকাশক
সর্বাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

রূপাকে আর তুনুকে

আকাশ .থকে পেড়ে এনো সাতরঙা রামধনুকে

ছোট্ট দুটি গল্পকথা হল বড়ই অল্প

বড় হয়ে তোমরা লিখো আকাশভরা গল্প

-জেঠু

এই লেখকের ছোটদের অন্যান্য বই

শাদা ঘোড়া

ঋষিকুমার

গৌর যাযাবর

হরিণের সঙ্গে খেলা

তালগাছের ডোঙা

পাখির খাতা

আমার বনবাস

আমাজনের জঙ্গলে

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

ছেঁড়াকাথার গল্প

১৯৮৩ ও ১৯৯৯ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত আমার দুটি গল্প নিয়ে আলাদা এই বই তৈরির পরিকল্পনা আসলে ‘দোয়েল’-এর। তাঁদের উদ্যোগেই ‘ভূতের বাঁশি’ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে। এটি সেই বইয়ের প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ।

১ জানুয়ারি, ২০১১

সূচি

ভূতের বাঁশি

দেবতাদের দেশে

ভূতের বাঁশি

পা. া এখন লরি চালায় । কলকাতা, বারাকপুর, কল্যাণী কিংবা রায়গঞ্জ, বহরমপুর, শিলিগুড়ি হলেও তবু কথা ছিল, পাঞ্জো মাল বোঝাই লরি নিয়ে যায় বম্বে, বাঙ্গালোর, দিল্লি, অমৃতসর, জম্মু, শ্রীনগর, লেহ, কালিকট, ত্রিবান্দ্রম, কন্যাকুমারী- আরও কাঁহা কাঁহা । মোটকথা, দূরের রাস্তা নেই তো পাঞ্জোও নেই । যত দূরের রাস্তা হবে, যত জঙ্গলের মধ্যে হবে, যত নির্জন হবে ততই নাকি সে পরীর দল দেখতে পায়, ঠাকুরদেবতাদের দেখে, একবার নাকি ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতিদের ভূত দেখেছিল, ভারি মিষ্টি চেহারা ।

পাঞ্জো প্রথমে চালাত নৌকো । হাতানিয়া-দোয়ানিয়া, সপ্তমুখ, ঠাকুরান, ওদিকে মাতলা বিদ্যাধারী- এদিককার সব নদীই তার মুখস্থ । মাঘের শীতে, চৈত্রের ঝড়ে, শ্রাবণের বৃষ্টিতে সে কত দিন তার নৌকোয় যাত্রী নিয়ে সুন্দরবনের কোথায় না কোথায় পৌঁছে দিয়েছে!

নদীতে নদীতে ঘুরতে ঘুরতেই সে মাধ্যমিক পাশ করে গেল । পাঞ্জো বলে সে তারার আলোয় খবরের কাগজের হেডিং আর পুন্নিমের চাঁদের আলোয় স্কুলের বই পড়তে পারে । আর গান গাইবার পক্ষে নদীর হাওয়ার মতো ভালো মাইক নাকি আর হয় না । তবে নদীতে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার, আকাশের প্রাণীরা ঝাঁক ঝাঁক তারার চেহারা ধরে দলে দলে জলে নেমে পড়ে । আকাশ থেকে ডাঙার চেয়ে জলে নামাই তো বেশি সুবিধে ।

সেকেন্ডারি দিয়ে কলকাতায় তার মাসির ঝুপড়িতে থেকে সে কিছুদিন টাইপিং শেখার চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত ড্রাইভারি শিখল । গ্রামে তার মা বাপ ভাই বোন তার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে, তাদের দুবেলা চাল জোটে না, যে করেই হোক চাকরি তার একটা চাই-ই ।

প্রথমে জুটল হপ্তায় দুদিন গাড়ি চালানোর কাজ । কাদের যেন ঠাকুমা প্রত্যেক শনি-মঙ্গলবার গাড়ি চড়ে বাগবাজার যায়, গঙ্গায় চান করতে ।

এরপর সে কিছুদিন এখানে ওখানে কখনও ডাক্তার, কখনও উকিল, কখনও জ্যোতিষীর গাড়ি চালাল । একবার একটা কনস্টেবলের ট্যাক্সিও সে চালায় । শেষমেশ পাঞ্জো স্টেটসম্যান কাগজের এক সাহেবের গাড়ির ড্রাইভার হয়ে গেল ।

এই চাকরিটায় মাইনেও ভালো, আর সকলের কাছে বেশ খাতিরও মেলে । সুন্দরবনে তার বাড়িতে পাঞ্জো এখন আশ মিটিয়ে টাকা দিতে পারে । মাসের প্রথম রবিবার সে নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে আসে । মা বাবা ভাই বোনেদের জন্য কলকাতা থেকে কত রকম

জিনিস যে কিনে নিয়ে যায় তার মা বাবা পর্যন্ত তার অনেকগুলোর নাম জানে না, দেখেইনি কখনও ।

এমন ভালো চাকরিটা হঠাৎই চলে গেল । তার দোষের মধ্যে সে তার সাহেবকে দমদমে ভোররাতে বিলেতের প্লেন ধরাতে পারেনি । পারবে কী করে? সে তো গাড়ি চালাতেই পারছিল না । মাঘ মাস, কুয়াশায় দুহাত দূরের রাস্তাও দেখা যায় না, তার ওপর আকাশ থেকে কুয়াশায় মিশে দলে দলে নেমে আসছে বাচ্চা বাচ্চা সব পরী । ফগ লাইট জ্বেলে, সার্চ লাইট জ্বালিয়ে, বারবার হর্ন দিয়েও এগোয় কার সাধ্যি! শুধু কুয়াশা হলে পাঞ্জো ফগ লাইট জ্বেলে কুয়াশা ফুঁড়ে ঠিক গাড়ি বের করে নিয়ে যেত । কিন্তু পরীদের ভিড় ঠেলে সে গাড়ি চালাবে কী করে? একেবারে বাচ্চা বাচ্চা সব পরী!

সাহেব ঠাস করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আর সব গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, তোর গাড়িই শুধু পরীতে আটকে রেখেছে, বাঁদর?

তারপর থেকে পাঞ্জো দূরপাল্লার লরির ড্রাইভার । সে প্রতিজ্ঞা করেছে এ জীবনে আর কখনও কোনও সাহেবের গাড়ি চালাবে না । কত জঙ্গলের পথ সে পেরিয়ে যায়, কত পাহাড়ের গা ঘেঁসে কত দূরের রাস্তায় সে লরি চালায়, শুকিয়ে যাওয়া নদীর ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে তার লরি নদীর ওপারে চলে যায়, কত তারা ভরা আকাশের নীচে একদম জনহীন রাস্তায় সে ঘন্টার পর ঘন্টা লরি চালায়, চালাতে চালাতে সে কখনও গলা ছেড়ে, কখনও শিস দিয়ে গান গায় ।

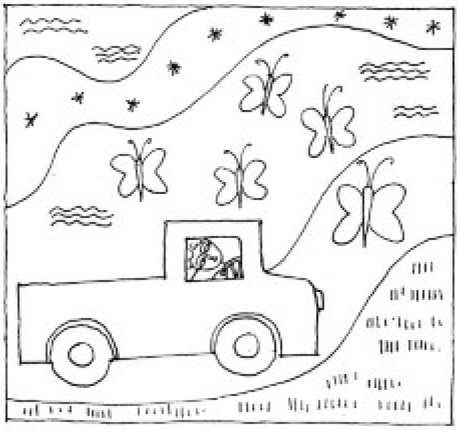

পাঞ্জো আজকাল কত কী যে দেখতে পায় সব কি আর বলে শেষ করা যায়? তার দুঃখ, সে যেসব আশ্চর্য জিনিস দেখে, অন্যরা সেসব দেখতে পায় না ।

তার লরির হেল্পার ইল্লে-বিল্লে বলে দুটো কমবয়সি ছেলে । তারা বলে, পাঞ্জো ডেরাইভার পুরো মানুষ না, আদ্ধেকটা ভূত, আর আদ্ধেকটা দেবতা, আদ্ধেক পরী-হুরি, আদ্ধেকটা মানুষ ।

আমাকে বলতেই হয়, একটা মানুষকে অতগুলো আদ্ধেক করবি কী করে রে পাগলা?

শুনে ইল্লে নিজের ন্যাড়া মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কী জানি বাবু, কিন্তু কথাটা একদম সত্যি, আমরা নিজের চোখে দেখেছি, বিশ্বেস না হয়, বিল্লেকে জিজ্ঞেস করুন।

বিল্লেরও একই রকম ন্যাড়া মাথা, কচি কদমফুলের মতো, সারা বছর এই রকমই থাকে। আমি কিছু বলবার আগেই সে-ও ইল্লের মতো মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পাঞ্জোর মুখস্থ। ভারতের সব বড় বড় রাস্তাই তার নিজের হাতের তালুর মতো চেনা। কিন্তু জোছনা রাতে, আকাশ কালো করা বৃষ্টির দুপুরে, শীতের কুয়াশায়, কিংবা তুসতুস করে বরফ পড়বার সময় সেইসব রাস্তা দিয়ে লরি চালাতে চালাতে হঠাৎ হঠাৎ এমন সব দৃশ্য পাঞ্জো দেখতে পায় যে তখন এতদিনের চেনা রাস্তাও আর চেনা থাকে না, মনে হয় যেন কোনও এক অচেনা দেশে চলে এসেছে! একদিন হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ি রাস্তায় লরি চালাতে চালাতে কিন্নর-কৈলাস পাহাড়চুড়োয় সে নাকি স্পষ্ট দেখেছে মহিষাসুরের সঙ্গে দুর্গা ঠাকুরের সাংঘাতিক যুদ্ধ হচ্ছে। তখন সূর্য অস্ত যেতে গিয়ে থমকে গেছে, মহিষাসুরের রক্ত ছিটকে এসে লেগেছে মেঘের গায়ে, মেঘের সেই রক্তমাখা চেহারা কেউ নাকি কল্পনাও করতে পারবে না।

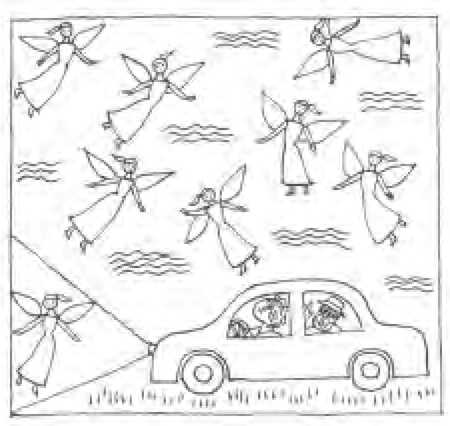

পাঞ্জো কথা বলে হড়বড় করে, ফাঁকা রাস্তায় লরি ছোটাবার মতো। আমি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হিমাচলের ওরকম দুর্গম জায়গায় তুই লরি নিয়ে গিয়েছিলি কেন?

-বা! একবার নাকি, কত বার আমাকে যেতে হয়- আপেল আনতে হয় না?

তা-ও বটে।

পাঞ্জোকে আমি প্রথম দেখি সুন্দরবনে বিদ্যাধরী নদীর তীরে, এক পূর্ণিমা রাতে। সুন্দরবনের গোসাবা থেকে বিজয়নগর গ্রামে আসছিলাম, রাত তখন অনেক।

রাত হলেও নৌকো নিয়ে কোনও অসুবিধা নেই, কেননা নৌকোর মাঝির বাড়িও বিজয়নগরে।

বিজয়নগরে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় বারোটা বাজে। ভাঁটার সময়। নদীর ডাঙা থেকে জল অনেক দূর সরে গেছে। জল থেকে ডাঙা পর্যন্ত দইয়ের মতো কাদা। অতটা কাদা পেরিয়ে আমাদের ডাঙায় পৌঁছতে হবে।

আমি নৌকো থেকে নেমে আর সকলের নামার জন্য অপেক্ষা করছি। ডাঙায় পা দিয়েই আছাড় খেলেন নবনীতাদি। নবনীতা দেবসেন। অত বড় পণ্ডিত ও কবি, তার ওপর সব সময় দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁকে ওইভাবে কাদার ওপর আছাড় খেয়ে পড়তে দেখে আমি হাসতে হাসতে একবারে লুটিয়ে পড়ি আর কী! প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ দেখি নবনীতাদির বড় মেয়ে পিকোলো কাদায় পা দিয়েই এক আছাড়! তারপর ছোট মেয়ে টুম্পার একই অবস্থা। মাঝি ছাড়া আমাদের দলে আর ছিল নবনীতাদির ভাই দীপঙ্কর আর আমার সুন্দরবনের বন্ধু অতনু, এরাও দুজনে পর পর ধপাস ধাঁই।

আমি ছাড়া সকলেরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাদামাখা, সকলেই খুব হাসছি, তারই মধ্যে সবাই পা টিপে টিপে সাবধানে ডাঙার দিকে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ কিসে হোঁচট খেয়ে আমিও কাদায় পড়লাম। হোঁচট লাগল কিসে? দেখি ছোট একটা ছেলে কাদার মধ্যে ঘুমোচ্ছে, তাতেই পা আটকে আমি পড়ে গেছি। ছেলেটা ততক্ষণে উঠে বসেছে। যে মাঝির নৌকোয় আমরা এলাম, জানা গেল এ সেই মাঝিরই ছেলে। বাবার দেরি দেখে নদীতে এসে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

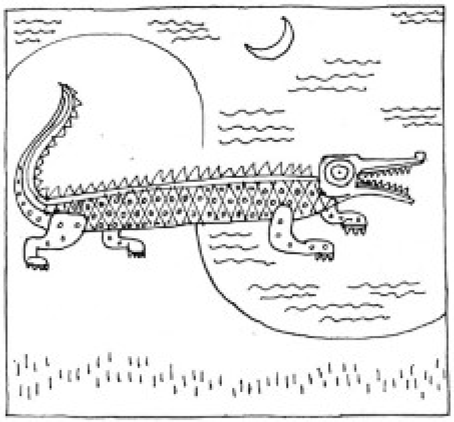

মাঝি বলল, এ ছেলে মহা বদমাশ। এর নাম কি রেখেছি জানেন বাবু? পাঞ্জো।

পাজি আর শয়তান মিলে নাকি পাঞ্জোই হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এভাবে কাদায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলি কেন?

পাঞ্জো ফটফটে জ্যোৎস্নায় আমার চোখে চোখ রেখে বলল, ঘুমোচ্ছিলাম না তো, আমাকে একটা কুমিরের ভূত কাদায় শুইয়ে রেখেছিল । যাতে উঠে পালাতে না পারি সেজন্য তার লম্বা লেজটা আমার বুকের ওপরে ফেলে রেখেছিল । বাপরে কী ভারি! ঘুমোব কী, আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল!

হঠাৎ আমার একেবারে কাছে এসে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, চারদিন আগে একাদশীর দিন মরেছে, তার আগে পর্যন্ত এখানে রোজই দুপুরে রোদ পোয়াত, শুক্লপক্ষে রাতে জোছনা পোয়াত, আমি একে কতদিন নদী থেকে মাছ ধরে খেতে দিয়েছি- এ ছিল এ তল্লাটের কুমিরদের রাজা ।

আমরা সেবার সুন্দরবনে গিয়েছিলাম সেখানকার জেলে-মউলিদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনতে । মউলি কাদের বলে জানো? যারা বন থেকে চাক ভেঙে মধু আনে ।

এ ঘটনা অনেক দিন আগের । পিকোলো-টুম্পার বাবা তখন গরিবদের কিসে ভালো হয় তা নিয়ে মোটা মোটা বই লিখছেন, সেইসব বইয়ের জন্যই সাহেবরা তাঁকে গত বছর নোবেল প্রাইজ দিল ।

এক রবিবার পাঞ্জো এল আমি তার সঙ্গে মানসসরোবরে যাব কি না জানতে । কলকাতা থেকে নেপালের কাঁকরভিটা দিয়ে কাঠমান্ডু হয়ে সে জিপে তিব্বতের মানসসরোবর যাবে । অনেক দিন থেকেই তার নাকি কৈলাস-মানস যাবার খুব ইচ্ছে । সেইজন্যই সে আজকাল লরির বদলে জিপ চালায় ।

পাঞ্জোর মুখ ভারি শুকনো দেখাচ্ছে, হয়তো সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি । আমি তাকে জোর করে যা হোক কিছু খাইয়ে দিলাম ।

খাওয়া শেষ করে পাঞ্জো খানিকক্ষণ কী ভাবল, তারপর বলল, অনেক দিন বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে যাওয়া হয়নি । একবার বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের মাথায়, সন্ধ্যাতারার ঠিক নীচে, দেখলাম কর্ণ আর অর্জুন দুজনে বাঁশি বাজাচ্ছে, বাঁশিটা বড় একটা গুলতির মতো, অথচ

সেটা তলতা বাঁশের, তার একটা মুখে ফুঁ দিচ্ছে কর্ণ, আরেকটা মুখে অর্জুন, আর বাঁশিতে যে ফুটোগুলো থাকে, যে ফুটো আঙুল দিয়ে ঢেকে আর খুলে সুর তোলা হয়, গুলতির দণ্ডটার ওপর সেইসব ফুটোর কয়েকটাতে কর্ণ আর কয়েকটায় অর্জুন আঙুল খেলাচ্ছে । একটাই বাঁশি এরকম একসঙ্গে দুজনকে বাজাতে আমি কোথাও দেখিনি ।

আমি হাসি চেপে বললাম, কর্ণ অর্জুন- তুই চিনলি কী করে? তাছাড়া ওরা তো কবেই মরে ভূত হয়ে গেছে । ভূত কি বাঁশি বাজায়?

পাঞ্জো উত্তর না দিয়ে খুব অবাক হয়ে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল,

তারপর বলল, সুরটা এত সুন্দর, এখনও আমার কানে লেগে আছে । অনেকটা এইরকম-শুনুন-

বলে সে দুচোখ বুজে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে শিস দিতে লাগল ।

দেবতাদের দেশে

ঘোড়া যখন পাহাড় বেয়ে উঠবে, তুমি সামনের দিকে ঝুঁকে বসবে । আর যখন নীচের দিকে নামবে তুমি পেছনে হেলে যাবে । পথে ঝরনা পড়বে । ছোট নদী পড়বে । ঘোড়া তার ওপর দিয়ে যাবার সময়, জলে মুখ নামাতে চাইলে জানবে তার তেষ্টা পেয়েছে, সে জল খেতে চায়, তুমি লাগাম আলগা করে দেবে যাতে সে জলে মুখ দিতে পারে ।

আমাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়ে আবু ঘোড়ায় চড়ার এইসব নিয়ম বুঝিয়ে দেয় । কথা বলছিল হিন্দি-উর্দু মিশিয়ে । মাঝে মাঝে একটু একটু বাংলাও লাগাচ্ছিল । বলল, পানিমে মু দেনে নেই সাকে ত উসকো বহোত গোসসা আ যায়গা । বহোত রাগ হয়ে যাবে । আমাদের ঘোড়া ঠিকমত দানাপানি পায় না । তাতেই এমন দুবলা হয়ে গেছে । বড্ড রোগা । পাহাড়ের চড়াই-উতরাই ভাঙতে ওর তকলিফ হয় । ইয়াদ রাখনে চাহিয়ে । অর্থাৎ এসব কথা মনে থাকে যেন ।

কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে বাসে গুলমার্গ এসেছি । এদিকটায় এখনও বরফ পড়া শুরু হয়নি । পাহাড়ের মধ্যে আরও এগিয়ে গেলে, আরও ওপরের দিকে যেতে পারলে নাকি বরফ দেখা যাবে । হাত দিয়ে পাহাড়ের গায়ের বরফ ছোঁয়া যাবে ।

গুলমার্গের পর বাস আর যায় না । বাসরাস্তা এখানেই শেষ । বাস থেকে নামতেই কাশ্মীরি ঘোড়াওলারা ছেঁকে ধরল । সবাই একসঙ্গে চেঁচাতে লাগল, আমার ঘোড়া সবসে আচ্ছা ঘোড়া । আমার ঘোড়া বিলকুল পক্ষীরাজ । একজন বলল, তার ঘোড়াটা নাকি মোগল সম্রাটদের ঘোড়ার বংশধর । সবাই চেঁচাচ্ছে, আমার ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের বরফ দেখে আসুন । দো ঘন্টা বিশ রুপয়া । তিন ঘন্টা পঁয়ত্রিশ রুপয়া । চার ঘন্টার জন্য ঘোড়া নিলে পঁচাশ রুপয়া ।

লোকগুলোর চেহারা দেখে মনে হয় যেন একদল পাহাড়ি দস্যু । পোশাক অনেকটা কাবুলিওলাদের মতোই, মুখে ছুঁচল দাড়ি । চোখগুলো সাঙ্ঘাতিক জ্বলজ্বলে । লোকগুলো যেভাবে আমাকে তেড়ে-ফুঁড়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল, প্রথমটা আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম । ভাবলাম, এই বুঝি আমার ব্যাগ-ট্যাগ লুট করে । একটু পরেই বুঝতে পারলাম, এরা খুবই নিরীহ আর বড্ড গরিব । যে যার নিজের ঘোড়া গছাবার জন্যই ওরকম চেঁচামেচি করছে । যার ঘোড়া নেব, সেই তো টাকা পাবে । কটা টাকার জন্য ওই দস্যুর মতন চেহারার লোকগুলোর এমন ভিখিরির মতন কাণ্ড- চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না ।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত ওদের মধ্যে যে লোকটাকে ঠিক একেবারে গল্পের বইয়ে পড়া তাতার দস্যুর মতন দেখতে, তাকে বললাম, চলো, তোমার ঘোড়াই নেব ।

বলা মাত্র লোকটা এক ঝটকায় আমাকে ঘোড়াওলাদের ভিড় থেকে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের কানে একহাত চাপা দিয়ে গলা তুলে ডাক পাড়ল, আ-বু-উ, এ আ-বু-উ ।

জায়গাটা ছোট একটা মাঠের মতন । একদিকে কয়েকটা দোকান । একটু দূরে অনেকগুলো ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে । এদিক-ওদিক কয়েকটা বাড়ি, হোটেল এইসব । তারপরই পাহাড় আর পাহাড়ের গায়ে বনজঙ্গল ।

লোকটা তার জামার পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হিন্দিতে বলল, দুঘন্টায় পাহাড়ের ওপরে বরফের দেশে ঘুরে আসুন । যানে দো ঘন্টা, আনে দো ঘন্টা । অর্থাৎ যেতে দুঘন্টা, আসতে দুঘন্টা । চার ঘন্টাকে লিয়ে আপ সওয়ার বন যাইয়ে । দূর পাহাড়ে গিয়ে নিজের চোখে দেখুন কীভাবে বরফ পড়ে ।

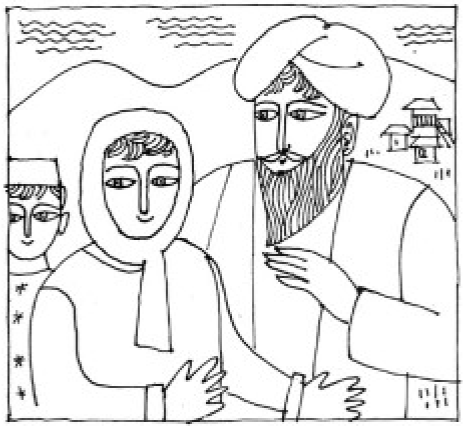

ততক্ষণে রোগা ফরসা চেহারার একটা ছেলে তার মতোই রোগা চেহারার একটা ঘোড়া নিয়ে এসেছে । তার বাঁ গালে একটা ঘা । লোকটার কথা শুনে সেও বলল, কমসে কম দো ঘন্টা নেহি যায়গা তো বরফ বিলকুল নেহি মিলেগা ।

দুঘন্টায় ঘোড়া কত দূর যায় আমি কিছুই জানি না । একা একা অত দূর যাবার কথা ভেবে আমার একটু ভয়ই হল । তাছাড়া ঘোড়া নিজে থেকে পথ চিনে বরফের কাছে গিয়ে আবার ঠিকমতো ফিরতে পারবে তো!

আমি লোকটাকে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে যাবে নিশ্চয়ই?

মেরা বেটা আপকা সাথ সাথ রহেগা । ডরিয়ে মাৎ । ভয়ের কিছু নেই ।

ছেলেটার বয়েস খুব বেশি হলে দশ-বারো বছর । ওইটুকু ছেলে আমার সঙ্গে থেকে কী লাভ?

আমি বললাম, না, না, তুমি চলো ।

লোকটা এ-কথায় হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল, চার বছর হল গরমিন্ট (সরকার) আমার এই ছেলেকে ট্যুরিস্টদের ঘোড়ায় চড়িয়ে ঘুরিয়ে আনার অনুমতি দিয়েছে। এই দেখো ওর সরকারি কার্ড।

ছেলেটার বুকের কাছে জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লোকটা একটা ছাপানো কার্ড বের করে প্রায় আমার নাকে ঘষে দেয় আর কি!

তারপর হঠাৎ তার আলখাল্লার পকেট থেকে ছোট্ট একটা আপেল বের করে আমাকে দিয়ে বলল, গোসসা মাপ কিজিয়ে। আমার রাগ মাপ করে দিন। মিঠা শেফ খেতে খেতে চলে যান। ভয়ের কিছু নেই। রোজই এ পথে ঘোড়া যায়। ঘোড়ার খুরে খুরে পথে দাগ পড়ে গেছে। সেই চেনা পথ ছেড়ে ঘোড়া এদিক-ওদিক এক পা-ও যাবে না।

ছেলেটা আমার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে জামার ভেতরে রেখে বলল, চলিয়ে সাব, ঘোড়ে পর বৈঠিয়ে।

আমি টাকা বের করতে যাচ্ছি, লোকটা বলল, আভি নেহি। ঘুরে এসে টাকা দেবেন।

এটাই নাকি এখানকার নিয়ম।

ছেলেটা আমাকে ও ঘোড়াটাকে মাঠের কিনারে নিয়ে গিয়ে বেশ কায়দা করে আমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল। পেছন থেকে ঘোড়াওলা চেঁচিয়ে বলল, এ আবু- দেরি করবি না। চার ঘন্টার মধ্যেই ফিরে আসা চাই। মনে রাখিস।

ঠিক হ্যায় আব্বাজান। বলে সে আমার হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার নিয়ম বোঝাতে বোঝাতে আমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলল।

এতক্ষণ হিন্দিতে সে আমাকে দুয়েকবার বাদে আপনি আপনি করেই কথা বলছিল, এবার কিন্তু পুরোপুরি তুমি বলতে শুরু করল। এই বৈশাখে আমি সতেরো শেষ করে আঠেরোয় পড়েছি, আবুর থেকে প্রায় সাত-আট বছরের বড়, সেকেন্ডারি পরীক্ষায় বৃত্তির টাকা পেয়ে কাশ্মীর বেড়াতে এসেছি, ও কিন্তু বেশ তুমি তুমি করে বলে যাচ্ছিল।

পাহাড়ের গায়ে ঘোড়া খুব খাড়া মতন জায়গায় উঠছে, আবু বলল, বহোত চড়াই।

সামনে ঝুঁকো, সাব। হাঁ অ্যাইসাই, ব্যস, সিধা হো যাও।

আবার ঘোড়া যখন পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় মই দিয়ে নামার মতন নীচে নামে, আবু চাপা গলায় হিস হিস করে ওঠে, পিছে হিল যাও। আরও, আরও হেলে বসো। পা দুটো সামনের দিকে ঘোড়ার কান বরাবর লম্বা করে দাও।

এরকম একবার উঁচুতে উঠে, একবার নীচের দিকে নেমে, সামনে ডাইনে বাঁয়ে বিরাট বিরাট পাহাড়ের চুড়ো দেখতে দেখতে এগোচ্ছি, আবু বোধহয় একটু পিছিয়ে পড়েছে, হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের গা বেয়ে একেবারে কিনার ঘেঁসে ঘোড়া নীচের দিকে নামছে। আমার ডানদিকেই বিরাট খাদ। পাঁচ-ছশো ফুট গভীর তো

হবেই । ঘোড়া একবার পা হড়কালে.... উঃ, ভাবতে গিয়েই আমার মাথার মধ্যে চিরিক করে উঠল । ভয়ে ভয়ে যতবারই নীচে তাকাচ্ছি ততবারই দমবন্ধ হয়ে আসে ।

নিচামে মৎ দেখো, উপরমে দেখো, পাহাড় দেখো, আশমান দেখো, আরামসে বয়ঠো ।

বলতে বলতে আবু আমার সামনে ডানদিকের জঙ্গল থেকে প্রায় দৌড়ে আমার কাছে চলে এল । পাহাড়ি পথে এতক্ষণ হেঁটে এমনিতেই তার হাঁপ ধরে গেছে, তার ওপর দৌড়ে এসে তার গলার আওয়াজ হয়ে গেছে ফ্যাসফ্যাসে । রাস্তা এত সরু যে সে ঘোড়ার পাশে এসে লাগাম ধরে ঘোড়াকে ঠিক সাবধানে নিয়ে যেতে পারছে না । ঘোড়ার পিছনে থেকে চাপা ফ্যাসফ্যাসে গলায় আমাকে শুধু ওই এক কথাই বলে চলেছে- উপরমে পাহাড় দেখো, আশমান দেখো, আরামসে বয়ঠো ।

বিপদের ওপর বিপদ, ঘোড়াটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল । আর এগোবে না । আমি দুহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রায় চিৎ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছি, নীচের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছি না । ঘোড়া কেন এভাবে এরকম বিপজ্জনক রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল কিছুই বুঝতে পারছি না । এদিকে আবু পিছন থেকে ঘোড়ার গায়ে চটাচট চাপড় মারছে আর মুখ দিয়ে হুরুরুর হ্যাট হ্যাট করে তাকে এগোবার জন্য বৃথাই ব্যস্ত করে তুলতে চাইছে ।

ভয়ে বিরক্তিতে আমি আকাশের দিকে চোখ রেখে চেঁচিয়ে উঠলাম, আ! তাড়া দিচ্ছ কেন? ঘোড়া খাদে পড়ে যাবে যে!

আবু আমার কথা যেন শুনতেই পায়নি, সে একভাবে ঘোড়াকে হাঁটাবার চেষ্টা করতে লাগল ।

আমি তো ভয়ে কাঠ । সাহস করে মাথাটা বাঁদিকে একটু ঘুরিয়ে দেখি, ঘোড়া যেখানটায় থেমে আছে তার সামনের রাস্তা আরও সরু ও আরও বিপজ্জনকভাবে বাঁক নিয়েছে । আর তার বাঁদিকে বেশ চওড়া একটা রাস্তা ঢালুর ওপর বড় বড় গাছের তলা দিয়ে এগিয়ে গেছে । ওই অবস্থায়ই আমার হঠাৎ চোখে পড়ল, বাঁদিকের ওই ভালো রাস্তার মুখে বড় বড় তিনটে পাথরের চাঁই আর গাছের ডালপালা জড়ো করে কেউ রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছে । ঘোড়াটা মাঝে মাঝেই মুখ ঘুরিয়ে একবার ওই রাস্তার দিকে আর একবার সামনের বিপজ্জনক রাস্তাটা দেখছে আর বোধহয় ভয়ে পিছন দিক দিয়ে বিশ্রী আওয়াজ বের করছে ।

আবু তখনও আশা ছাড়েনি । ও কি বোকা, না ইচ্ছে করেই আমাকে খাদের মধ্যে ফেলে দিতে চায়? সামনের বিপজ্জনক রাস্তায় ঘোড়াকে জোর করে ঠেলে না দিয়ে বাঁদিকের চওড়া

রাস্তার পাথর-টাথর সরিয়ে ওই পথে গেলেই তো বাঁচা যায় । সেটা ওর মাথায় আসছে না কেন?

আমি বললাম, আবু, বাঁদিকের রাস্তাটা বন্ধ । পাথর আর গাছের ডালপালা পড়ে আছে । ওগুলো সরিয়ে দাও, ঘোড়া ওই পথেই যেতে পারবে ।

আবু এক লাফে ঘোড়ার পেটের কাছে চলে এসে আমাকে চমকে দিয়ে বলল, আমিই তো ওই রাস্তা বন্ধ করলাম । না হলে তো ঘোড়া এতক্ষণে খুরের চিহ্ন ধরে ওই রাস্তায়ই উঠে পড়ত । আমি চাই ও সামনের রাস্তা ধরেই যাবে ।

আমি ভীষণ রেগে গিয়ে বললাম, কেন? তুমি আমাকে খাদে ফেলে দিতে চাও?

এত শীতেও আবুর কপাল ঘামে ভেজা । সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত গলায় বলল, তোমাকে ফেলে দিতে চাই না, তোমার সঙ্গে এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাই ।

কথাটা শেষ করে আবু আমাকে খুব সাবধানে ধরে ঘোড়া থেকে নামিয়ে আনল ।

বলল, একটু জিরিয়ে নাও । ঘোড়াটাও একটু জিরোক । তুমি এবার ঘন্টাখানেক হাঁটতে পারবে তো? এবার আমি ঘোড়ায় উঠব । না হলে ওকে এই রাস্তা দিয়ে কিছুতেই হাঁটানো যাবে না ।

আবুর কথা শুনে আমি তো অবাক । বড় বড় গাছের নীচে কনকনে ঠান্ডায় একটা ঢিবির ওপর বসে আমি ভালো করে আবুকে দেখলাম । ও ততক্ষণে ঘোড়াটাকে একটু পিছিয়ে এনে নিজের আলখাল্লার মতন জামার ভেতর থেকে ঠিক এক মুঠো ঘাস বের করে খেতে দিল । তারপর আমার পাশে বসে পড়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, আমি বাঙালি । আমাদের বাড়ি কলকাতায় ।

সেকি? তোমার নাম কী? তুমি কাশ্মীরের ছেলে নও?

আমার নাম শিবু । এখানে আমার নাম আবদুল্লা । আবু বলে ডাকে ।

ওই ঘোড়াওলা লোকটা যে তোমাকে নিজের ছেলে বলল?

খুব ছোটবেলায় আমি যখন নার্সারিতে পড়তাম, তখন আমাকে ছেলেধরারা চুরি করে । জলন্ধর বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে নিয়ে গিয়েছিল । প্রায় এক বছর আমি ওখানে ছিলাম । তারপর একদিন রাতে সুযোগ পেয়ে আমি ছেলেধরাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাই । কলকাতার পথ তো চিনি না । ঘুরতে ঘুরতে একদিন কাশ্মীরে চলে আসি । এই ঘোড়াওলা আমাকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়ে কাজ শেখায় । তারপর থেকে ওর কাছেই আছি ।

আর এই ঘোড়ার কাজ করি । ঘোড়াওলা লোকটা আমাকে এমনিতে খুব ভালোবাসে । কিন্তু রোজই শাসায়, পালাবার চেষ্টা করলে একেবারে শেষ করে দেবে ।

আমি বললাম, কলকাতায় তোমার বাড়ি কোথায়? ঠিকানা কী?

আবু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, ঠিকানাটা আমি জানি না । আমাদের বাড়ির কাছেই একটা হাসপাতাল আছে ।

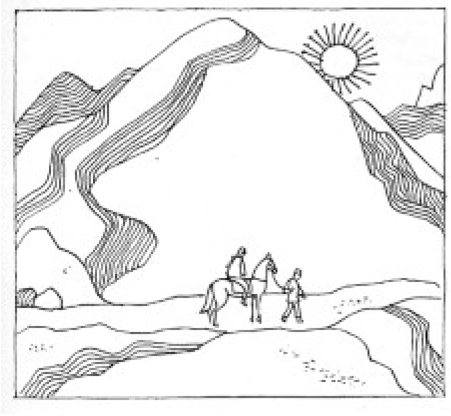

সূর্য হেলে পড়েছে। ঠান্ডাও বাড়ছে। মনে হয় গায়ে একেকবার কেউ যেন বরফের চাঁই চেপে ধরছে। তার মধ্যেই একটা দৃশ্য দেখে আমার মন ভরে গেল। রোদ পড়ে দূরে বরফে ঢাকা পাহাড়ের চুড়োগুলো একেবারে সাদা ধপধপ করছে। আমি এতদিন যত সাদা দেখেছি এই সাদার কাছে সেসব কিছুই নয়। একেবারে সত্যিকার সাদা।

আবু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি রাজি তো? আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে তো?

আমি উঠে তার হাত ধরলাম। বললাম, আবু, থুড়ি শিবু, আমি তো ভাবতেই পারছি না তুমি এত বছর ধরে তোমার মা-বাবাকে ছেড়ে এত দূর-দেশে পড়ে আছ। কলকাতায় চলো, আমি ঠিক তোমার ঠিকানা খুঁজে বার করব।

আবু তিড়িং করে একবার লাফিয়ে নিয়ে বলল, আমি জানতাম। তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছি তুমি আর সকলের মতো ওই রাস্তার ভয়ে এখান থেকে ফিরে যেতে চাইবে না। তুমি খুব ভালো।

তুমি কি রোজই এরকম সবাইকে তোমার পালানোর প্ল্যান বলো নাকি?

না, না। বছরে দুয়েকবার চেষ্টা করি। কারও মুখ দেখে যদি মনে হয় লোকটা খুব ভালো শুধু তখনই আমি এই রাস্তাটা বন্ধ করে ঘোড়াকে ওই রাস্তায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করি।

কিন্তু মুখ দেখে তো সব সময় মানুষ চেনা যায় না। ওই রাস্তাটায় পৌঁছেই সওয়ার আমাকে গালিগালাজ করে, তখন আর কী করি, ওপরের চওড়া রাস্তাটা পরিষ্কার করে ওই রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে দূর থেকে বরফ দেখিয়ে আবার সেই ঘোড়াওলার কাছে ফিরে যাই।

ওই বিপজ্জনক রাস্তা ছাড়া কি তোমার পালাবার আর রাস্তা নেই?

চলে যেতে হলে ওই একটাই রাস্তা।

এবার আবু চলেছে ঘোড়ার পিঠে, আমি ঘোড়ার পিছু পিছু পায়ে হেঁটে। এভাবে হেঁটে গেলে খাদে পড়বার ভয় নেই। ভয় একটাই, কেবলই মনে হয় এই বুঝি আবু ঘোড়াসুদ্ধ খাদে পড়ে গেল।

পথটা একইভাবে কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। সেখানে রাস্তাটাও খানিকটা চওড়া। এখান থেকে রাস্তা ঘুরে ঘুরে ওপরের দিকে উঠে গেছে।

আবু এইখানে ঘোড়া থেকে নেমে আরেকবার তার জামার ভেতর থেকে ঘাস বের করে ঘোড়াকে খেতে দিল। খাওয়া হয়ে গেলে সে আমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে নিজে ঘোড়ার লাগাম ধরে টানতে টানতে প্রায় দৌড়তে লাগল। মুখে সেই হুরুরুর হ্যাট। পাহাড়ের গায়ে ওরকম উঁচু রাস্তা, সে দিব্যি ঘোড়াকে দৌড় করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমিও তালে তালে ঘোড়ার পিঠে বেশ ঝাঁকুনি খাচ্ছি। আ, এই নাহলে আর ঘোড়া!

উঠতে উঠতে হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরে আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম । মাত্র কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে পাহাড়ের চুড়ো বেয়ে নেমে এসেছে বিরাট সাদা চাদরের মতো বরফের ঢল । মাইলের পর মাইল শুধু বরফ আর বরফ । এই কি স্বর্গ? দেবতাদের দেশ?

ঠান্ডায় আমার মুখের চামড়া জ্বালা করছে । হাত-পা নাড়তে পারছি না । কিন্তু এই আশ্চর্য সুন্দর জায়গায় মনে হচ্ছে এত কষ্টও যেন কিছু না । এমন জায়গাও আছে পৃথিবীতে! না-কি এ আমাদের পৃথিবীর বাইরে!

আবু এসব ছেড়ে কলকাতায় ফিরে যেতে চায়?